: ভূমিকা :

বাংলা গদ্যের সৃষ্টি তথা এদেশের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হওয়ার শুভলগ্ন থেকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার প্রশ্নটি নিয়ে যে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল তা আজও শেষ হয় নি। বরং যতদিন যাচ্ছে ততই এই বিতর্কের ধার ও ঝাঁঝ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলা ভাষা বিজ্ঞান আলোচনার উপযুক্ত কিনা তা নিয়েও আবার অনেকে পরীক্ষা - নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। কিন্তু পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আপন মহিমায় সমাদৃত এবং বিপুল এক শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভাব প্রকাশের প্রিয়তম মাধ্যম বাংলা ভাষাকে নিয়ে কেন এই লজ্জা জনক টানাপোড়েন তা বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমেই বিশ্লেষণ করতে হবে শিক্ষার মাধ্যম জনিত সমস্যাটিকে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। তাই এদেশে বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্য নূতন কিছু নয়। কিন্তু আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ন্যায়-দর্শন সহ চিকিৎসা, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই চর্চা করতেন সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। আর জন্মের শুরু থেকেই এ ধরণের গুরু গম্ভীর বিষয়কে আপন বুকে স্থান দেওয়া কোন ভাষার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই প্রাচীন কালে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা হয় নি। তাই জন্মলগ্ন থেকে সে ক্রমাগত বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচরণ করে।

আমাদের জাতীয় জীবনে ঊনবিংশ শতাব্দী নানান দিক থেকে তাৎপর্য পূর্ণ। এই সময়ে বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের সূচনা, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত এবং রাজনৈতিক - সামাজিক প্রেক্ষাপটের উল্লেখ যোগ্য পরিবর্তন প্রভৃতি অনেক কিছুই ঘটেছিল পরস্পরের ওপর নির্ভর শীল হয়ে। নানান দিক থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা –

শিক্ষা - সংস্কৃতি জোয়ারের জলের মত প্রবেশ করে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরকে আপ্লুত করে দিয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে বয়ে নিয়ে আসা পরাধীনতা, জড়তা ও সামাজিক - অর্থনৈতিক অবিচারের শৃঙ্খল তখন একদিকে যেমন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে আমাদের বাঁধার চেষ্টা করছিল তেমনি আবার অন্যদিকে আমাদের মনে সার্বিক বিকাশের যুগ-জগতে উত্তীর্ণ হওয়ার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা [redacted] জেগেছিল। এই পরস্পর বিরোধী দুই শক্তির ঝাপটায় আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এসেছিল এক প্রবল আলোড়ন। এক দীর্ঘাবধ থেকে অবশ হয়ে তখন সংস্কৃত ভাষা যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল সে পর্যায় থেকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার তেমন কোন সুযোগ তার আর ছিল না। আর এই সুযোগে এদেশের মাটিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও অন্যান্য গুরু গম্ভীর বিষয় চর্চার মাধ্যম রূপে [redacted] বাংলা ভাষা তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে এগিয়ে এসেছিল।

বাংলাদেশে প্রথানুগ পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই। এই শিক্ষা ব্যবস্থার এক অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশীয় জনগণকে ইংরাজী ভাষা ও বিজ্ঞান সহ অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে তদানীন্তন প্রাতঃস্মরণীয় কিছু বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সহযোগিতা নিয়ে কয়েকটি মিশনারী সংস্থা আন্তরিক চেষ্টা চালান। এ কথা ঠিক যে মিশনারীদের সমস্ত কাজকর্ম কখনোই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এদেশে পদার্পণের পর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁরা যা করেছেন এবং করছেন তার অনেক কিছুই উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ বাধক। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁদের অনেক কার্য-কলাপই বাংলাদেশের নবজাগরণ এবং বাংলা ভাষার উন্নতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। প্রকৃত পক্ষে ব্রিটিশ সরকার কেবল নিজেদের কাজকর্ম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করার স্বার্থেই এদেশের মানুষকে ইংরাজী ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষায় আকৃষ্ট করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু মিশনারীদের ভূমিকা ছিল এর থেকে কিছুটা ভিন্নতর। এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কায়েম করতে সাহায্য করা ছাড়াও সে সময় তাঁরা জনগণের মঙ্গলার্থে অনেক ভাল কাজও করেছিলেন। উপরন্তু এই মিশনারীদের মধ্যে উইলিয়াম কেরীর

মত মানব প্রেমিক ব্যক্তিও বিরল ছিলেন না। এই সমস্ত মহানচেতা বিদেশীরা আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট না হলে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রদীপটি প্রজ্বলিত হতে হয়ত আরও দেরী হয়ে যেত। যাই হোক, এই সব শিক্ষানুরাগী বিদেশী এবং কিছু বঙ্গ সন্তানের এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের এ যেন বাসনা অনেকাংশে বাস্তবায়িত হওয়ার একটি ভাল সুযোগ পায় এবং বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে। কারণ এই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। তারপর ডেভিড্ হেয়ারের উদ্যোগে এবং সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড্ ঈস্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কলেজে ইংরাজী, বাংলা, ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্গে অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদিকেও পাঠ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু এই কলেজে এইসব বিষয়ের পঠন - পাঠন ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই প্রচলিত হয়েছিল।

সে যাই হ'ক, মিশনারীদের উদ্যোগে এবং হিন্দু শিক্ষাব্রতীর প্রচেষ্টায় গত শতকের প্রথম পর্বে কলকাতা এবং অন্যান্য জেলায় যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাভাষার মাধ্যমেই পঠন - পাঠন প্রচলিত ছিল। এইসব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব বর্তেছিল ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির ওপর। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই প্রতিষ্ঠান থেকে গণিত শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় প্রণীত 'অঙ্কপুস্তক' (রবার্ট মে) প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৭ সালে এবং 'গণিতাঙ্ক' (জন হার্লে) প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৯ সালে। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের পাঠোপযোগী বাংলা ভাষায় লেখা বেশ কয়েকটি ভূগোলের বই ও প্রকাশ করে। তবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বকোষটি নির্মিত হয় উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী ও 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির মিলিত প্রচেষ্টায়। বহুমুখী প্রতিভার আকর এই স্বল্পায়ু বিদেশী ব্যক্তিগত চেষ্টায় বাংলা

ভাষা আয়ত্ত করার পর এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার অংশ বিশেষ অনুবাদ করে ১৮১৯ সালে 'বিদ্যাহারাবলী' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হিউম্যান অ্যানাটমির অভিনবতম তত্ত্ব সম্বলিত এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রথম সার্থক মুদ্রিত গ্রন্থ। তাই এই গ্রন্থটির রচনাকালটি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার উৎসমূল হিসাবে স্বীকৃত।

কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও ফেলিক্স সাহেবের 'বিদ্যাহারাবলী' একটি উন্নত মানের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ তবুও এইটি বাংলাভাষায় সার্থক বিজ্ঞান চর্চার প্রথম নিদর্শন নয়। কেননা এর বহু আগেই কিছু দূরদর্শী বঙ্গ সন্তান আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে বেশ কিছু পুঁথি রচনা করেছিলেন। এই সব পুঁথির অনেকগুলিই আজ কালের গর্ভে বিলীন। তবুও আশার কথা যে কয়টি এখানে ওখানে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেগুলিও কীটদষ্ট। উপরন্তু উপরোক্ত অধিকাংশ পুঁথিরই বহু পত্র হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই প্রাপ্ত প্রতিটি পুঁথির রচনাকাল ও রচয়িতার পরিচয় সঠিকভাবে নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ। যাই হ'ক এই সমস্ত পুঁথি গুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় "ডাক চরিত্র" নামক পুঁথিটির। এই পুঁথিটিতে শিশু শুশ্রূষা এবং রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসার কিছু নিদর্শন আছে। এ পর্যন্ত "ডাকচরিত্র" ব্যতীত আর যে কয়েকটি বাংলা পুঁথিতে বিজ্ঞান চর্চার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে "জারণমারণ বিধি" (১১৭২ বঙ্গাব্দ), "চিকিৎসা গ্রন্থ" (১১৯২ বঙ্গাব্দ), "চিকিৎসা দর্পণ" (১২৪৪ বঙ্গাব্দ)। "রোগ বিবরণ" (১২৫৩ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, রচনাকাল নিরূপণ করা দুরূহ অথচ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার স্বাক্ষর বহন করছে এমন যে সব বাংলা পুঁথি আজও বর্তমান, সেই সব পুঁথিগুলির মধ্যে অন্যতম 'বৈদ্যকগ্রন্থ বা কবিরাজী পাতড়া', 'ঔষধ সংগ্রহ' 'নিদান' ঔষধি প্রকরণ', 'রোগ লক্ষণ' ইত্যাদি। তাই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসকে পুঁথির কাল তথা মুদ্রণের কাল ভেদে আদি এবং আধুনিক এই দুই যুগে ভাগ করে নেওয়াই শ্রেয়। কেননা, তা যদি না করা হয় তা হলে যে সব দূরদর্শী বঙ্গ সন্তান পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া আসার আগেই আয়ু

ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উপরোক্ত পুঁথিগুলি প্রণয়ন করেছিলেন তাঁদের অনুসন্ধান করা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নানান প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়ে তাঁদের এই শুভ প্রচেষ্টা ধারা বাহিকতা রক্ষা করতে না পেরে অজান্তেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফেলিক্স সাহেবের " বিদ্যাহারাবলী " বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে যুগের প্রবর্তন করেছিল সে যুগের সামগ্রিক অবস্থা ছিল অনেক অনুকূল। তাই তাঁর যুগ থেকে যদি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা চলত তা হলে আজ উচ্চ শিক্ষার যে কোন স্তরেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে পঠন - পাঠন প্রবর্তিত হতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বিদেশী শাসকদের চক্রান্ত মূলক শিক্ষানীতির জন্য তা হয় নি। মেকলে সাহেব ছিলেন এই চক্রান্তের প্রধানতম রূপকার। মূলত তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ীই একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া শিক্ষার অন্যান্য সব স্তরেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরাজী ভাষার একচ্ছত্র অধিকার কায়েম হয় এবং বাংলা ভাষার মাধ্যম বিজ্ঞানের পঠন - পাঠন ও চর্চার সব রকম সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। আর ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উপরোক্ত কারণে সেখানেও মাতৃভাষার বদলে ইংরাজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে থাকে। সব মিলিয়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, এদেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীর ভাষার কোন বিকল্প খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে অনেক আন্দোলন এবং অনেক চেষ্টার পর ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন [স] স্তরে এবং ১৯৪৮ সালে ইন্টারমিডিয়েট ও স্নাতক স্তরে বাংলা ভাষা বিজ্ঞান সহ অন্যান্য বিষয়ের পঠন - পাঠনের মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায়। এইভাবেই শিক্ষা নীতির আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সব রকমের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার জগত থেকে বাংলা ভাষা দীর্ঘ সময় ব্যাপী নির্বাসিত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

তবে অতীতে যাই ঘটুক না কেন বর্তমানে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা প্রসারিত হওয়ার পক্ষে যে একটা দৃঢ় জনমত গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

এছাড়া বাংলা ভাষা বিজ্ঞান চর্চার জনপ্রিয় মাধ্যম রূপেও ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে । আর এই সব অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার জন্যই বাংলা ভাষা আজ ক্রমশঃ বিজ্ঞান শিক্ষার ও চর্চার বিভিন্ন স্তরে পাশাপাশি ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে ।

অবশ্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অঙ্গনে এহেন অনুকূল বাতাবরণ একদিনে তৈরী হয়নি । দীর্ঘ দুটি শতাব্দী ধরে বহু বুদ্ধিজীবী , শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানী নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে মাতৃভাষাকে বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠা করার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলেছিলেন । যে সময়ে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষার কোন স্বীকৃতি ছিল না তখনো বহু গ্রন্থকার ও প্রাবন্ধিক রচনা করেছেন বিজ্ঞান বিষয়ক অসংখ্য উন্নত মানের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ । অন্যদিকে যখনই বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার কোন সুযোগ আমাদের মাতৃভাষা পেয়েছে তখন সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিজের যোগ্যতাকে সে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে । সব মিলিয়ে আমাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিকথায় বারে বারে যে সত্যটি উদ্ঘাটিত হয় তা হল , সব রকমের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শিক্ষার মাধ্যম রূপে স্বীকৃতি না থাকার এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাকে সর্বস্তরে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রকাশ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্যেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের ক্ষেত্রে বারে বারে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে ।

তবে সুখের কথা এই যে, গত শতকের প্রথম পর্ব থেকে বাংলা ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল কোন প্রতিবন্ধকতা , চক্রান্ত বা বা প্রতিকূলতাই কোন দিনই তাকে একেবারে স্তব্ধ করে দিতে পারে নি । ফলত বর্তমানে বিজ্ঞানের এমন শাখা খুব কমই আছে যে শাখার ওপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচিত হয় নি । তাই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার আধুনিক যুগের ইতিহাসের আকার - আয়তন রীতিমত বিশাল । এই ইতিহাসকে শাখা অনুযায়ী নিম্নলিখিত উপ বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে । যেমন :

(১) চিকিৎসা বিজ্ঞান : (অ্যালোপ্যাথিক , আয়ুর্বেদিক , হোমিওপ্যাথিক ,

প্রভৃতি চিকিৎসা বিদ্যার বিভিন্ন শাখার ওপর অনূদিত ও রচিত পুস্তকাদি এই বিভাগের আলোচ্য বিষয়।)

(২) শারীর, শুশ্রূষা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান:

(হিউম্যান অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, এমব্রায়োলজি, নার্সিং, হাইজিন, নিউট্রিশন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচিত পুস্তকাদি এই বিভাগের আলোচ্য বিষয়।)

(৩) রসায়ন বিজ্ঞান, রাসায়নিক-শিল্প ও পদার্থ বিজ্ঞান:

(কেমিস্ট্রি, কেমিক্যাল-ইন্ডাস্ট্রি, ফিজিক্স প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচিত পুস্তকাদি এই বিভাগের আলোচ্য বিষয়।)

(৪) কৃষি, উদ্ভিদ, প্রাণী ও পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান:

জুওলজি, ভেটেরিনারী সায়েন্স, বোটানি, ও
(এগ্রিকালচারাল সায়েন্সের ওপর রচিত পুস্তকাদি এই বিভাগের আলোচ্য বিষয়।)

(৫) কারিগরী বিদ্যা:

(ইঞ্জিনিয়ারিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে রচিত পুস্তকাদি এই বিভাগের আলোচ্য বিষয়।)

(৬) বিবিধ:

(জেনারেল সায়েন্স, নৃতত্ত্ব, ধ্বনি বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অবলম্বনে রচিত পুস্তকাদি এই বিভাগের আলোচ্য বিষয়।)

কিন্তু মুদ্রণ যুগে আমাদের আদি বাংলা ভাষায় যে ধরণের বিজ্ঞান চর্চা হয়েছিল তার মধ্যে এই রকমের বিষয় বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাই শুধু রচনা কাল অনুযায়ী পর পর সাজিয়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার আদি যুগের নিদর্শন [illegible]

হিসাবে পরিগণিত পুঁথিগুলির আলোচনা সপ্তমাশ্রিত হবে ।*

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার আদি যুগ' শীর্ষ নামাঙ্কিত অধ্যায়ে যে সমস্ত পুঁথির কথা আলোচিত হবে সেই ধরণের আরো কিছু পুঁথি অন্য কোথাও সংগৃহীত থাকার সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না । তাই এখানে এই পুঁথিগুলিকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার একমাত্র নিদর্শন হিসাবে অভিহিত করা হচ্ছে না ।